কিশোরসাহিত্য নিয়ে কিছু কথোপকথনের শুরু: বিভূতিভূষণের ‘চাঁদের পাহাড়‘

---সুনন্দ কুমার সান্যাল (প্রকাশিত: ‘কালধ্বনি‘, কলকাতা, ২০০৬)

বাংলা সাহিত্যসমালোচনায় কিশোরসাহিত্যের কোন জায়গা নেই বললেই চলে। যেহেতু বড়রাই ছোটদের জন্য লেখেন, তাই তাঁদের প্রজন্মের কোন মূল্যবোধ পড়ুয়াদের মনে কতটা ছাপ ফেলছে সে প্রশ্ন স্বাভাবিকই শুধু নয়, উঠতি মনের ওপর টেলিভিশন বা সিনেমার প্রভাবের মতই তা জরুরি বিষয়। তবু সেটা খতিয়ে দেখার তেমন কোনও প্রয়াস চোখে পড়ে না। ‘কিশোরসাহিত্য‘ শব্দটা কতটা লিঙ্গনিরপেক্ষ সেটাই একটা সঙ্গত প্রশ্ন।, কেন না প্রমাণ করা কঠিন নয় যে এর সিংহভাগই ছোট ছেলেদের জন্য লেখা, মেয়েদের কথা ভেবে নয়। অথচ এ প্রসঙ্গে কলকাতার বইমেলা বা ঐ ধরণের গণমঞ্চে কোনও আলোচনা মনে পড়ে না। কিংবা কোনও ভিন্‌দেশ বা জাতিকে নিয়ে লেখা গল্প অপরিণত মনকে কী ভাবতে শেখায় সে বিষয়েই কি কখনোও বিতর্ক শোনা গেছে? এ ধরণের প্রশ্নে সংস্কৃতিমনস্কদের ভাবানোই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আর যেহেতু ট্র্যাডিশনের নামে লালিত এক অলস আত্মসন্তুষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করার ওপরেই নির্ভর করছে কিশোরসাহিত্য সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা, তাই প্রথম ধাক্কায় পাঠকের অস্বস্তি বাড়াতে ইচ্ছে করেই ঢুকে পড়া বাঙালির মনের সেই কুলুঙ্গিতে, বাংলার আইকনদের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্যই যেখানে অলিখিত আইন।

১৯৪৪ সালে প্রথম প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়‘ কিংবদন্তির মতন বাংলাদেশের প্রায় তিনটে প্রজন্মের কচিকাঁচাদের মোহিৎ করে রেখেছে। একসময় আমিও ছিলাম তাদেরই একজন, তাই আজ প্রবাসে অচেনা সব মানুষ ও সংস্কৃতিকে চিনতে গিয়ে, এক বিশেষ মহাদেশ সম্পর্কে ছোটবেলায় আমার হাতেখড়িতে আরও অনেককিছুর মতই এই বইয়ের পরোক্ষ দায় কতটা সে ব্যাপারে খোঁজ না নিয়ে পারি না। আফ্রিকায় গ্রামবাংলার দামাল ছেলে শংকরের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার এ এক আপাতনিষ্পাপ কাহিনী, যা আমাদের বারবার উড়িয়ে নিয়ে গেছে সেই অচেনা মুলুকে। প্রাঞ্জল সমস্ত বর্ণনা পড়ে দুর্দমনীয় আকাঙ্খা হয়েছে আফ্রিকা দেখার। কতবার নিজেদের কল্পনা করেছি শংকরের চরিত্রে। কিন্তু সমস্যাটা সেখানেই: কোন আফ্রিকার স্বপ্ন ছিল সেটা? পরে শিক্ষার সূত্রে যখন সেই আফ্রিকাই হল জানার বিষয়, প্রভূত অস্বস্তির সঙ্গে আবিষ্কার করলাম যে আমার কল্পনার আফ্রিকা প্রকান্ড এক ভ্রান্তিই শুধু নয়, ঐ মহাদেশের যে কোনও বাসিন্দার কাছে সে ছবি অত্যন্ত অপমানজনক।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় যদি প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে রাখা যায়: গড় শিক্ষিত বাঙালি আফ্রিকা বলতে কী বোঝে? এক কথায়, আদিমতার প্রতীক। দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশের কাছেই আফ্রিকা রাষ্ট্র, ভাষা, সংস্কৃতির বৈচিত্র্যহীন এক রহস্যময় ভূখন্ড, পৃথিবীর একমাত্র অঞ্চল যেখানকার প্রকৃতি আর জানোয়ারেরা মানুষের চেয়ে বেশি প্রচার পেয়েছে বরাবর। সেখানকার অধিবাসি বলতে জানা আছে শুধু ‘নিগ্রো‘ নামে কালো মানুষদের কথা, যাদের অনেকেরই নাকি এখনো সভ্য হতে বাকি। ‘ট্রাইব‘ বা ‘প্রিমিটিভ‘-এর মত ‘নিগ্রো‘ শব্দের উৎপত্তি উপনিবেশের যুগে জীববিদ্যা ও নৃবিদ্যার চত্বরে, তাই এর ব্যবহারে রয়েছে একটা গোটা মহাদেশের মানুষের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সূক্ষ্মতাকে অস্বীকার করার ও তাদের সম্পর্কে নানান মিথকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা। এই কারণে পশ্চিমের শিক্ষিত সমাজের সচেতন অংশ সত্তরের দশকেই বর্জন করেছে এই শব্দকে, যদিও সে খবর অনেক বাঙালিরই অজানা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে উত্তরপ্রান্তের টিউনিশিয়া, মিশর, আলজেরিয়া ইত্যাদিতে ফরসা মানুষের আধিক্যের জন্য সে দেশগুলো এই ভয় ও রোমাঞ্চ মেশানো কাল্পনিক আফ্রিকার মধ্যে পড়ে না কখনোই। এমন কি নেলসন ম্যান্ডেলা বা প্যাট্রিক লুমুম্বার মত মানুষের বৈপ্লবিক অবদানও এই বদ্ধমূল স্টিরিওটাইপকে বদলাতে যথেষ্ঠ নয়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যেকার সমাজতন্ত্রীদের ভূমিকা উল্লেখ্য। মার্কসবাদ শোষিতকে মুক্তির আশ্বাস জোগালেও শ্রেণীসংগ্রামের মেটান্যারেটিভ বরাবরই মানুষের জাতি ও ব্যক্তিপরিচয়ের অন্যান্য বাস্তব দিকগুলোকে অস্বীকার করে এসেছে। একেবারে মৌলিক স্তরে, মার্কসীয় তত্ত্ব কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের তৈরি করা মানবসভ্যতার সামাজিক বিবর্তনবাদী সংজ্ঞাকে পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেনি; শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যের যুক্তিতে শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপের বাইরের যে কোনও অ-পশ্চিমী সভ্যতাকে মার্কসবাদ খোলাখুলিভাবেই প্রগতির পরিপন্থী হিসেবে দেখেছে। তাই এ দেশের মার্কসবাদীরা একদিকে সবসময়ই আবেগাপ্লুত হয়ে বলেছেন ‘আফ্রিকার কালো মানুষের সংগ্রামে হাত মেলানোর’ কথা, আবার সেই সঙ্গে আফ্রিকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ফলে সেখানকার মানুষ ও তাদের সমস্যাকে মনে করেছেন অনগ্রসর, ‘প্রিমিটিভ’। এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম আঠারো শতকের ইউরোপে, আলোকপ্রাপ্তির সময়, যখন আফ্রিকার পরিচয় ছিল ‘অন্ধকার মহাদেশ’ নামে। ইউরোপের চোখে সে অন্ধকার ছিল সেখানকার মানুষের বর্ণেরও যেমন, তেমনই তাদের বর্বরতারও প্রতীক। সভ্যতার আলো দেখিয়ে সেই অন্ধকারকে জয় করার দায়িত্ব নিয়েছিল খৃষ্টধর্ম, অথচ আসলে পুরো ব্যাপারটা ছিল আফ্রিকা সম্বন্ধে কেবল ইউরোপের নিজেরই অজ্ঞতার অন্ধকার। পশ্চিমের ক্ষমতাবিস্তারের ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে, মূল্যবোধের সংকীর্ণতাকে আড়াল করা এই দম্ভের প্রচারে বিস্মিত হবার বিশেষ কারণ থাকে না, কিন্তু ব্যাপারটা জটিল হয়ে দাঁড়ায় যখন ঐ একই ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার আর এক জাতি আফ্রিকাকে দেখে শোষকেরই কাছ থেকে ধার করা চশমা পড়ে। আর এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে ‘চাঁদের পাহাড়’-এর মত বইয়ের কথা।

ছাপোষা জীবনের জোয়াল এড়াতে বাংলাদেশের ছেলে শংকর হঠাৎই ইংরেজ রেল কোম্পানির চাকরি নিয়ে চলে যায় পূর্ব আফ্রিকায়। এই তরুণের খেলাধুলোয় পারদর্শী মজবুত দিকটা অপুর সঙ্গে না মিললেও তার কল্পনাপ্রবণতা ও জানার আকাঙ্খায় রয়েছে অপুরই নিখুঁত ছায়া। কিন্তু যেখানে অপুর এ্যাডভেঞ্চার ছিল তার নিজের পরিপার্শ্বের অজানাকে জানার, ডানপিটে শংকর বেরিয়ে যায় এক সম্পূর্ণ অচেনা অপরের খোঁজে। বিভূতিভূষণ যে কোনওদিন আফ্রিকার ত্রিসীমানাতেও যাননি সেটা গোপন কিছু নয়, কিন্তু তথ্যের জন্য তিনি হ্যারি জনস্টন (১৮৫৮-১৯২৭) প্রভৃতি পর্যটকের রচনার সাহায্য নেওয়ায় আফ্রিকায় শংকরের ভ্রমণের বর্ণনা পেয়েছে এক অদ্ভুত চরিত্র। জনস্টনের প্রজন্মের ইংরেজদের ভ্রমণমূলক লেখার অধিকাংশই উনিশ শতকের শেষ বা বিশ শতকের প্রথমের আফ্রিকাকে নিয়ে, তাই এই কাহিনীর কাল্পনিক সময় ১৯০৯ সাল। সময়ের দূরত্ব অজানা মহাদেশকে কল্পনায় ঠেলে দেয় আরো বেশি দূরে, আফ্রিকা হয়ে ওঠে আরো বেশি রহস্যময়। যেখানে অপু আমাদের চিনতে শেখায় গ্রামবাংলার প্রকৃতির ছন্দ, পরম্পরার মূল্য, শংকরের সফর সেখানে দেখায় এক চূড়ান্ত বিপদসংকুল বন্যতার ছবি। নিজের ভাগ্য নির্ধারণে অক্ষম বর্বর আফ্রিকার ভূমিকা কেবল ভিনদেশীর হাতে পোষ মানার ও বিজয়ীর আলমারির তাকে এক দর্শনীয় স্মারক হয়ে ওঠার। তাই শংকর আফ্রিকায় যায় সেখানকার বুনো প্রকৃতির সঙ্গে বাজি ধরে তার বন-মরুভূমি-পাহাড়-জানোয়ারদের জয় করতে। অর্থাৎ এক পরাধীন দেশের চরিত্র যায় আরেক ভূখন্ডের পরাধীনতার সুযোগ নিয়ে তাকে অ-সভ্য সাব্যস্ত করে সাদা শোষকদের কাছে নিজেকে কৃতী প্রমাণ করতে, অপুর ক্ষেত্রে যা অকল্পনীয়। এমন কি হ্যারি জনস্টনের লেখাতেও পূর্ব আফ্রিকা সম্বন্ধে যে সব খুঁটিনাটি তথ্য মেলে, বিভূতিভূষণের গল্পে রয়েছে তারও শোচনীয় অভাব। যেমন গল্পের প্রথম দিকে শংকর ‘কেনিয়া মর্নিং নিউজ’ নামে খবরের কাগজ পড়ে এবং মোম্বাসা থেকে ট্রেন আসে, অথচ এই অংশে উগান্ডার উল্লেখ থাকলেও কোথাও বলা হয় না যে ঐ অঞ্চলে ঐ সময় ছিল কেনিয়া নামে আর এক ব্রিটিশ উপনিবেশ, যার একাধিক শহরের একটা হল মোম্বাসা। কিংবা উগান্ডায় যে তখন একাধিক আফ্রিকান রাজতন্ত্রের শাসন ছিল তাও পাঠকের অজানা থেকে যায়। অর্থাৎ দুটো আলাদা উপনিবেশ ও তাদের অধীনের অজস্র জাতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্রকে সরাসরি অস্বীকার করে গোটা অঞ্চলটাকে কল্পনায় বানিয়ে দেওয়া হয় এক বন্য বর্বর জমি, যাতে আফ্রিকাকে জয় করার আগে এখানেই বিপদ আর বাধার মোকাবিলায় শংকরের হাতেখড়ি হতে পারে।

জানোয়ারের গর্জন আর প্রাকৃতিক শব্দ বাদ দিলে এই কাহিনীতে আফ্রিকা বোবা। মানুষ বলতে মাত্র তিনরকম লোকের দেখা মেলে: মালবাহী কুলি; ভীতু, কুসংস্কারগ্রস্থ গ্রামবাসী; আর সন্দেহভাজন, হিংস্র কিছু লোক, যাদের কারুরই নেই কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ১৮৯৬ সালে পূর্ব আফ্রিকায় রেললাইন পাতা শুরু হলে ব্রিটিশ প্রশাসন সেখানে ছকমাফিক আমদানি করেছিল ভারতীয়দের, যাতে তারা ঠিকাদার হয়ে স্থানীয় মানুষদের খাটাতে পারে, আর তার ফলে দু‘দলের মধ্যে তৈরি হয় এক স্থায়ী বিদ্বেষের সম্পর্ক। সেই ইতিহাসের সূত্র ধরেই শংকরের পরিচিতি সীমাবদ্ধ থাকে ভারতীয় আর শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে। পর্তগীজ ভবঘুরে দিয়েগো আলভারেজ হয়ে ওঠে তার অভিযানের দিশারী; চেনা ও অচেনা ভারতীয়রা তাকে সাহায্য করে নানাভাবে; এমনকি মৃত ইতালিয়ান সৈনিক আত্তিলিও গাত্তির অভিযানের কাহিনী তাকে শক্তি জোগায় পায়ে হেঁটে কালাহারি পার হবার। কিন্তু এসবের মাঝে আফ্রিকার আদি বাসিন্দারা আগাগোড়া নেপথ্যেই থেকে যায় অশরীরীর মত। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবৈষম্যের কথা লেখকের অজানা ছিল এমন নয়, কেন না শংকরকে বার দুয়েক মুখোমুখি হতে হয় সেরকম পরিস্থিতির, যদিও দুবারই আত্মসম্মান রক্ষায় অক্ষম এই বাঙালিকে উদ্ধার করে আলভারেজ। অথচ আফ্রিকার কালো মানুষেরাও যে সেই একই অবিচারের আরও অনেক নির্মম শিকার, গল্পের কোথাও তার উল্লেখমাত্র নেই। উপরন্তু শংকরের গুরু আলভারেজের আচরণেই সেই শোষণের মানসিকতার আভাষ মেলে। তারা দুজন মাটাবেল অঞ্চলে তাঁবু ফেললে এক রাতে সেখানে হঠাৎ হাজির হয় কয়েকজন মাটাবেল নেতা। শান্তিপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলে তারা বিদায় নিলে আলভারেজ শংকরকে জানায় যে সে আগাগোড়া বন্দুক তৈরি রেখেছিল, শত্রুতার আশংকা দেখলেই যাতে লোকগুলোকে খুন করতে পারে। এই স্বার্থান্বেষী নির্মম ভবঘুরে যেন ইউরোপের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের খেলায় পিছিয়ে পড়া পর্তগালেরই প্রতীক; ভাঙ্গে তবু মচকায় না। কোথাও বিশেষ আমল না পেলেও সে নিজের বীরত্ব প্রমাণ করবেই, এবং সেক্ষেত্রে কয়েকজন কালো মানুষকে মেরে ফেলা তার কাছে বুনো জানোয়ার মারার চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার যুক্তিতে, খুনোখুনি ঘটলে তার কারণ হত মাটাবেল আগন্তুকদের বিশ্বসঘাতকতা, অথচ এ ব্যাপারে তার আগাম প্রস্তুতি প্রমাণ করতে বাকি রাখে না যে তার নিজেরই আফ্রিকার বাসিন্দাদের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আলভারেজের মানসিকতাও না হয় বোঝা যায়, কিন্তু জেনে অবাক লাগে যে এই চরিত্রই নিঃশর্তভাবে পায় শংকরের শ্রদ্ধা আর ভালবাসা।

পশ্চিমের বিশ্বদর্শনের ভিত্তিতে লেখা পৃথিবীর ইতিহাসে নিষ্ক্রিয় আফ্রিকা কিছু আবিষ্কার করে না, সে শুধু আবিষ্কৃত হয়। আর দক্ষিণ আফ্রিকার রিখটার্সভেল্ড পর্বতমালা (শংকরের ‘চাঁদের পাহাড়‘) সম্পর্কে লেখকের মন্তব্যে পাওয়া যায় তারই রেশ। যেমন দিয়েগো আলভারেজ শংকরকে বলে যে রিখটার্সভেল্ডে নাকি ‘দু-একজন দুর্দ্ধর্ষ দেশ-আবিষ্কারক বা ভৌগলিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া, কোন সভ্য মানুষ.......পদার্পণ করেনি। ঐ বিস্তীর্ণ বনপর্বতের অধিকাংশ স্থানই সম্পূর্ণ অজানা, তার ম্যাপ নেই, তার কোথায় কি আছে কেউ বলতে পারে না।‘ (পৃষ্ঠা ৬২) এখানে বলেই দেওয়া হচ্ছে যে নিজেদের পরিপার্শ্বকে বুঝতে আফ্রিকার বাসিন্দারা সম্পূর্ণ অক্ষম। সুদূর অপরকে আবিষ্কার করে শুধু ইউরোপ। সভ্যতা আসে নির্ভীক পর্যটকদের হাত ধরে, ভূগোল, প্রকৃতি বা মানুষ সম্পর্কে যাদের লেখা নথিই জ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ। সভ্যতার সংজ্ঞা নির্ধারণের অধিকারও যে কেবল তাদেরই, সারা বইতে লেখকের এই মতের নজির রয়েছে প্রচুর। তবে এর সবচেয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টান্ত মেলে দূর থেকে রিখটার্সভেল্ডকে দেখে শংকরের প্রথম প্রতিক্রিয়ায়: ‘‘রিখটার্সভেল্ড পর্বতমালা ভারতের দেবাত্মা নাগাধিরাজ হিমালয় নয়---এদেশের মাসাই, জুলু, মাটাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতই ওর আত্মা নিষ্ঠুর, বর্বর, নরমাংসলোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।‘‘ (পৃষ্ঠা ৯৯) মাসাইদের বাস রিখটার্সভেল্ড থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে পূর্ব আফ্রিকায়, অর্থাৎ ‘‘এদেশ‘‘ বলতে আবারও বুঝতে হবে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যহীন, মনোলিথিক এক আফ্রিকাকে। দ্বিতীয়ত, নিজে এক উপনিবেশের সন্তান হয়েও শংকর কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্দয় শ্বেতাঙ্গ শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করা, সার্বভৌমত্ব খোয়ানো জুলু বা মাটাবেলদের সংগ্রামী দিকটা দেখতে পায় না বিন্দুমাত্র। উল্টে তারাই তার চোখে হয়ে ওঠে ‘নরমাংসলোলুপ‘ ‘আদিম জাতি‘, যা আসলে আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইউরোপের পুরনো

সেই বর্বরতার অভিযোগেরই করুণ পুনরাবৃত্তি। শংকরের বিচারে এই অজানা মুলুকের কোনও কিছুই যে স্বদেশের সঙ্গে তুলনীয় নয় তার প্রমাণ মেলে এ প্রসঙ্গে হিমালয়ের উল্লেখে। যে ইতিহাস বা পরম্পরার গর্ব তাকে দেশের মাটিতে মনোমত জীবনের আশ্বাস জোগাতে পারেনি, ভিনদেশে অচেনার মুখোমুখি হয়ে সেই ঐতিহ্যের মোহই হয়ে ওঠে তার বর্ম। আত্মমূল্যের হিসেবনিকেশে মরীয়া এই বাঙালি যুবকের অভিযানের শিকার না হয়ে আফ্রিকার উপায় নেই, তাই বাস্তবে রিখটার্সভেল্ডের চেয়ে অনেক বেশি দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু সভ্যতার দম্ভে অন্ধ হিমালয় এক বিবর্তনবাদী পাঞ্জা লড়ে এই বিদেশী পাহাড়ের সাথে, আর সাদা মানুষদের কাছে শংকরের হীনমন্যতার বোধকে অনেকটা হালকা করে এক গভীর আত্মশ্লাঘা। এ হেন আগ্রাসনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা ফিরে পেতে উৎসুক শংকর কি তবে অপুরই অল্টার-ইগো? এবং সেই সূত্রে লেখকেরও?

শংকর হীরের খনি খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু অনেক পরে, কালাহারির মাঝে মৃত আত্তিলিও গাত্তির বোতলবন্দী দিনলিপি থেকেই সে প্রথম বুঝতে পারে যে ইতিমধ্যে একবার সে খনি দেখেও সে চিনতে পারেনি। গাত্তির কঙ্কালকে কবর দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে শংকরই পায় সেই খনির ‘মালিকানা‘, কেন না গাত্তি লিখে গেছে, ‘জগতের শ্রেষ্ঠ হীরক খনির মালিক আমি, কারণ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তা আমি আবিষ্কার করেচি। যিনি আমার এ লেখা পড়ে বুঝতে পারবেন, তিনি নিশ্চয় সভ্য মানুষ ও খৃষ্টান। তাঁর প্রতি আমার অনুরোধ, আমাকে তিনি যেন খৃষ্টানের উপযুক্ত কবর দেন। অনুগ্রহের বদলে ঐ খনির স্বত্ব তাঁকে আমি দিলাম!‘ (পৃষ্ঠা ১৭৩-৭৪) ভিন্নধর্মী হলেও সভ্যতার পরীক্ষায় শংকর যে সাদা মানুষদের সমকক্ষ তা এই শেষ অধ্যায়ে স্পষ্ট। এই সূত্রে নবীন বাঙালি পড়ুয়ারা আরও জানতে পারে, আফ্রিকার যে কোনও সম্পদের মালিকানার দাবি শুধু ভিনদেশী পর্যটক বা ভাগ্যান্বেষীর একচেটিয়া তো বটেই, সে মালিকানার হাতবদলের অধিকারও রেয়েছে কেবল তারই। এক্ষেত্রে লেখকের স্বচ্ছ, সরল বর্ণনাই হয়ে দাঁড়ায় গাত্তির এই আগ্রাসী মনোভাবের স্বীকৃতি। প্রশ্ন জাগে তখনই: অপুর মাঠঘাট, কাশবন, রেললাইন হাত বদলাচ্ছে দুই বিদেশীর মধ্যে, এমনটা কল্পনা করতে আমাদের কেমন লাগবে? ১৮৮৪ সালে বার্লিনে পশ্চিমী শক্তিগুলোর এক ঐতিহাসিক জমায়েতে আফ্রিকার একটা বড় মানচিত্রকে টেবিলে ফেলে তাকে বাঁটোয়ারা করে নেওয়া হয়েছিল, যে গণবলাৎকার থেকে জন্ম হয়েছিল সেখানকার আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশের। সেদিন সেখানে কোনও বাঙালি উপস্থিত না থাকলেও এই গল্প সুকৌশলে শংকরকে সেই লুঠের কাল্পনিক ভাগ পাইয়ে দেয়।

বাংলার আইকনদের নিয়ে কোনওরকম প্রশ্ন তুললে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও শিক্ষামূলক বিতর্কের বদলে স্রেফ তুলকালাম লেগে যায়। এই হাস্যাস্পদ আচরণকে মাথায় রেখে কয়েকটা কথা। এখানে মূল উদ্দেশ্য কিন্তু বাংলা কিশোরসাহিত্যের মূল্যায়ন, যে প্রসঙ্গে ‘চাঁদের পাহাড়‘ একটা উদাহরণমাত্র। ছোটদের জন্য লেখা সাম্প্রতিককালের অন্য অনেক বইকেও এভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভবই শুধু নয়, তা করা জরুরিও। যেমন ধরা যাক, সাহিত্যের এই শাখার স্তম্ভ সত্যজিৎ রায়ের লেখায় ফেলুদা, শংকু ইত্যাদি পুরুষ হিরোদের ভিড়ে বাঙালি কিশোরীদের লিঙ্গপরিচয় বিকাশের আগেই বিভ্রান্তিতে পড়ে কিনা সেটা নিশ্চয়ই বৈধ প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নটা করার আগেই ভক্তের দল কানে আঙুল দিলে, অথবা বিষয়টা নিয়ে একটা প্রাপ্তবয়স্ক কথোপকথন গড়ে তোলার বদলে প্রশ্নকারীকে হেনস্থা করায় বেশী উৎসাহ দেখালে অজ্ঞদের অজ্ঞতা তো দূর হয়ই না, পুনর্ভাষ্যের অভাবে শালগ্রামশীলার মত আগলে রাখা শিল্পকর্মটাও কিন্তু একসময় অনেক কম আকর্ষণীয় হয়ে পড়ে। সমালোচনা শব্দটা ইংরেজি ‘ক্রিটিসিসম্‘-এর আভিধানিক বাংলা হলেও দুইয়ের প্রয়োগে রয়েছে অনেক তফাৎ। পশ্চিমে আছে সাহিত্যসমালোচনার এক দীর্ঘ ধারা, যার সাথে পরিচিত সকলেই জানে যে কোনও কিছুর সমালোচনা বা পুনর্ভাষ্যের অর্থই তাকে বর্জন করা নয়, বরং তাকে আরও সমৃদ্ধ করা। ট্র্যাডিশনের স্বতঃসিদ্ধতা ও সে সম্পর্কে আত্মসন্তুষ্টিকে ক্রমাগত কাঠগড়ায় দাঁড় করানোই সংস্কৃতির প্রগতির অন্যতম শর্ত্ত, কেন না সে প্রয়াসে রয়েছে দেশকাল সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ইঙ্গিৎ। অথচ যে কারণেই হোক, বাংলায় সমালোচনা

শব্দটাকে অনেকেই নিন্দার প্রতিশব্দ মনে করেন, আর তাই সমালোচনাকারীও হয়ে যায় একজন পরচর্চারত অকাজের লোক।

নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে সংবেদনশীল হয়েও ছোটদের জন্য কলম ধরে বিভূতিভূষণ যে এক সদূর অপরের প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে কিন্তু মর্মাহত হওয়ার তেমন কোনও কারণ নেই, কেন না এতে প্রমাণ হয় তিনি তাঁর প্রজন্মেরই একজন। সে যুগে ব্রিটিশের সবচেয়ে শক্তিশালী উপনিবেশ ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অন্যান্য উপনিবেশের প্রতি সহমর্মিতার তেমন কোনও রেওয়াজ ছিল না, তাই বিভূতিভূষণের লেখায় সে ধরণের সচেতনতার ছাপ না পড়ারই কথা। সুতরাং অন্ধ (ও ক্রুদ্ধ) ভক্তেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণকে ক্রুশবিদ্ধ করার বা ক্ষতিকর বলে আজকের ছোটদের ‘চাঁদের পাহাড়‘ পড়তে না দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এর বিশ্লেষণ তবু অত্যন্ত জরুরী, কেন না অতীতের কিশোরসাহিত্যের পর্যালোচনার ওপরেই নির্ভর করছে আজকের কোনও লেখা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি। কিশোরসাহিত্য নিষ্পাপ ও সমালোচনার উর্দ্ধে, এই অজুহাতে আসল দয়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে বরং সাহিত্য ও তার পুনর্ভাষ্য, এই দুইয়েরই সাথে ছোটদের পরিচয় করানো উচিৎ একই সঙ্গে, গড়ে তোলা প্রয়োজন সমালোচনার এক ধারা। তবেই তাকানো যাবে আরো হালের সব রচনার দিকে, জানা সম্ভব হবে কেমন করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সৃষ্ট কাকাবাবু আর সন্তুর এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীগুলো --যেমন ‘সবুজ দ্বীপের রাজা‘-- সন্তুর বয়সী ছেলেদের মনে মানুষের সভ্যতা সম্পর্কে এক বস্তপচা রোম্যান্টিক দর্শন ঢুকিয়ে দিতে বিভিন্ন অচেনা অপরকে পণ্য করে বারংবার। কিন্তু যেখানে আজ ছোটদের জন্য প্রকাশিত উঁচুমানের বাংলা পত্রিকা প্রায় নেই বললেই চলে, সেখানে সম্ভব হবে কি এ ধরণের এক নতুন ট্র্যাডিশন তৈরি করা? বিশ্বায়িত দুনিয়ায়, যেখানে দূরের অস্তিত্বকে জানা ও তার সঙ্গে নানাস্তরে আদানপ্রদান আজ অনিবার্য, সেখানে অপরকে আমরা কীভাবে দেখি আর সে সম্পর্কে আমাদের উত্তরসূরিদেরই বা কী ভাবতে শেখাই, তার পর্যালোচনার গুরুত্ব নিয়ে কোনও সন্দেহ চলে কি?